Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সোনিয়া সেহেলী

রোলঃ ২১৫০০৬৭৯

১৭ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সোনিয়া সেহেলী

রোলঃ ২১৫০০৬৭৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সোনিয়া সেহেলী, আইডিঃ ২১৫০০৬৭৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্টু সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৭ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

সোনিয়া সেহেলী

আইডিঃ ২১৫০০৬৭৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	**পৃষ্ঠা সংখ্যা**
লেখিকার কথা	৫
ভূমিকা	৬
পরিবার বলতে যা বোঝায়	১০
১।ইসলামি পরিবারের পরিচয়	১০
২।পরিবার - স্থায়ী সংস্থা	১২
৩।পরিবার বিষয়ে প্লেটোর অভিমত	১৩
৪।পরিবারের অপরিহার্যতা	১৪
৫।পরিবারের ভিত্তি	১৪
৬।পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব	১৫
৭।পারিবারিক ব্যবস্থার ভাঙন	১৭
৮।পরিবারই শিশুর প্রথম বিদ্যালয়	২২
৯।পরিবারের প্রতি দায়িত্ব	২৪
১০।পারিবারিক বন্ধন,ঈমান ও তাক্বওয়া	২৬
১১।বিয়ে > পরিবার গঠন > দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা	২৮
১২।পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৩৩
শেষ কথা	৪০

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম

লেখিকার কথা

সমস্ত প্রশংসা তার কেবল সেই মহান রাব্বুল আলামিনের যিনি আমাকে একটি পরিবারে বেড়ে ওঠার তাওফিক দিয়েছেন,যখন পৃথিবীর বহু মানুষ পরিবারহীন।আবার তিনিই তাওফিক দিয়েছেন তার এই নগন্য বান্দিকে "ইসলামের দৃষ্টিতে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব" সম্পর্কে দুটি কথা লেখার।যতটা সুন্দর করে লেখা দরকার ছিল ততটা সুন্দর করে পারিনি,কিন্তু চেষ্টা করেছি।তাই ভুলভ্রান্তিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

ভূমিকা

সমাজের প্রাণকেন্দ্র হল পরিবার। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার শুধু একটি উত্তম সামাজিক প্রতিষ্ঠানই নয়, বরং একটি পবিত্র সংস্থা। পরিবারের সুখ, শান্তি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়াও রয়েছে একটি আইনগত ও সামাজিক দিক। নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হল পরিবার। সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয় পরিবারকে কেন্দ্র করে। পবিত্র আল কোরআনে পারিবারিক সদস্যদের মুহসিনীন বা প্রাচীর ঘেরা দুর্গে অবস্থানকারী সুরক্ষিত লোকজনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইসলামে পরিবার শুধু স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবারের পরিসর আরও ব্যাপক। নিকটাত্মীয়স্বজনও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক, দয়া, করুণা এবং সহানুভূতি তো আছেই, বাড়তি দায়িত্বশীলতার প্রশ্নও জড়িত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনের ওপর নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি; স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে চললে পারিবারিক পরিবেশ অনেকাংশে সুখ ও শান্তিতে ভরে ওঠে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারই হল মানুষ গড়ার মূল কেন্দ্র এবং সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি। এ জন্য পরিবার গড়ার ব্যাপারে ইসলাম বিশেষভাবে যত্নবান হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে।

আল্লাহতায়ালা দাম্পত্য জীবন গঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে স্বামীর জন্য বিবাহের আগে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণের জোগান দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করার কথা বলেছেন। পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করার আগেই একজন পুরুষের উচিত তার স্ত্রীর ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভরণপোষণ করার মতো আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করা। মহান আল্লাহপাক বলেন- ‘আর সন্তানের পিতার দায়িত্ব যথাবিধি তাদের (মা ও শিশুর) ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।’ (সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৩)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ·) বলেন, এ আয়াত দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে, শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণপোষণ ও জীবন-ধারণের অন্যান্য দায়িত্ব বহন করবে পিতা। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, ‘মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করাবে।’ মাতা-পিতার ওপর সন্তানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট বয়সে তার

জন্য আলাদা শয়নের ব্যবস্থা করা। মহানবী (সা·) বলেন, ‘তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তোমরা তাদের নামাজের জন্য আদেশ কর।’ আর দশ বছর বয়স হলে তাদের নামাজের জন্য তাগিদ দেবে এবং তাদের বিছানা আলাদা করতে দেবে।

হজরতলোকমান (আ·) নিজপুত্রকে যে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন পবিত্র কোরআনে তার উল্লেখ হয়েছে এভাবে- হে বৎস নামাজ কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবুর কর। নিশ্চয়ই এটি দৃঢ়তার কাজ। (সূরা লোকমান, আয়াত-১৭)। শিশুরা নরম মাটির মতো শৈশবে যে মূল্যবোধ ও আদব আখলাকের পরিবেশে বেড়ে উঠবে, তাই পরবর্তী জীবনে স্থায়ী হয়ে যায়। এ কারণে পরিবার হচ্ছে শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। এ সময় মাতা-পিতা নিজেদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব দিয়ে এবং ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে তাদের প্রতিপালন করবেন। হজরত দয়াল নবী (দ·) বলেছেন, পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অন্যতম অধিকার হচ্ছে, তাকে উত্তম শিক্ষা দেয়া এবং সুন্দর একটি নাম রাখা। (বায়হাকি শরিফ)। ছোটবেলা থেকেই শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এটি মাতা-পিতার ওপর ফরজ। এই কর্তব্য পালন না করলে গুনাহগার হতে হবে এবং আখেরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। হজরত মহানবী (সা·) বলেছেন, দোলনা থেকে শিক্ষা শুরু করো। তিনি মুসলিম শিশুকে দোলনায় দেখতে চেয়েছেন। অযত্ন-অবহেলায় ধুলাবালিতে নয়। আর তাকে এ বয়স থেকেই আনন্দপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। শিশুকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে লালন-পালনের সঙ্গে তার মননশীলতার বিকাশও প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অভিভাবককে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে মিথ্যা বলা, নাপাক থাকা, নামাজ না পড়া ইত্যাদি বিষয়গুলো না থাকে। এ জন্য চাই সহায়ক পরিবেশ। প্রিয়নবী (সা·) শিশুদের জ্ঞানদানের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাদের সাঁতার কাটা, এমনকি তীর চালানো পর্যন্ত শিক্ষা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলাম বলেছে, তুমিআয় বুঝে ব্যয় কর। দারিদ্র্য যেমন ইসলাম কামনা করে না, অনুরূপভাবে ইসলামে বাহুল্য বর্জনের নির্দেশও রয়েছে। কারণ সীমাহীন দারিদ্র্য অনেক

ক্ষেত্রে মানুষকে কুফরির পথে ধাবিত করে, আবার সীমাহীন প্রাচুর্য আর অপরিকল্পিত সন্তান-সন্ততি ও পারিবারিক সদস্য বৃদ্ধি পরিবারে অশান্তি ডেকে আনে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিপথগামী করে। হজরত নূরনবী (দ·) বলেছেন- 'তোমাদের প্রত্যেককেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং সবাই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। পুরুষ তার গৃহে দায়িত্বশীল, এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। অনুরূপভাবে নারী তার স্বামীগৃহে একজন দায়িত্বশীল এবং দায়িত্বের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।' (বুখারি ও মুসলিম শরিফ)। তাই ইসলামী ঐতিহ্য রক্ষা ও বরকতময় পারিবারিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আমাদের কতিপয় বিষয়ের প্রতি যত্নবান হতে হবে; ১· স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য ও পারিবারিক জ্ঞান ২· এক্ষেত্রে তাদের বয়সের সমতা ৩· আর্থিক সামর্থ ৪· পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি সবার পরিচ্ছন্নতা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ৫· ইসলাম প্রবর্তিত উন্নততর ধারণা প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

(https://erfan.ir/bengali/55130.html)

আল্লাহ বলেন, 'হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে (অধিকার) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।' (সুরা নিসা : ১)

পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে কেন্দ্র করে প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে। এই প্রথম পরিবারের সদস্য স্বামী ও স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি বললাম, 'হে আদাম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখানে যা ইচ্ছে খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, গেলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শামিল হবে।' (সুরা বাকারা: ৩৫)

এই পরিবার থেকে মানব জাতি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

সকল নবী-রাসুলের ব্যক্তিগত জীবনে ও সময়কালে পরিবার বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ বলেন, আমি তোমার পূর্বেও রাসুলগণকে পাঠিয়েছিলাম, আর তাদের দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তানাদি।' (সুরা রাদ: ৩৮)

ইবরাহিম (আ.) স্বীয় পরিবারের জন্য দোয়া করেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! 'আমাদের তোমার অনুগত কর, আমাদের বংশে একদল সৃষ্টি কর, যারা তোমার আজ্ঞাবহ হয়। আর আমাদের ইবাদাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা বাকারা : ১২৮)

পরিবার বলতে যা বোঝায়

স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র করে পরিবার গড়ে ওঠে। পরিবারই মানব সমাজের ভিত্তি। আদম-হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম মানব পরিবার গড়ে ওঠে। সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আজও এ পরিবার প্রথা চালু আছে। সারাদিনের কর্মক্লান্তি, বিভিন্ন কারণে পাওয়া দুঃখ-বেদনায় যেখানে সবাই শান্তি খুঁজে— সেটা হলো পরিবার। পরিবারে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকলে জীবন সুখময় হয়। পক্ষান্তরে পরিবারে কাঙ্ক্ষিত শান্তি না থাকলে জীবন হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণ, বিষাদময়। এজন্য দরকার একটি আদর্শ পরিবার। যা হবে মানুষের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির আকর।

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও দাদা-দাদী নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। ‘পরিবার হলো পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয় ও তাদের সন্তান-সন্ততির সমষ্টি।

(সূত্র: https://www.nayashatabdi24.com/religion-and-life/44594)

১। ইসলামি পরিবার এর পরিচয়

যে পরিবার ইসলামি ভাবধারা, ইসলামি নীতিমালা ও ইসলামি বিধিবিধান এর আলোকে গড়ে ওঠে তাকে ইসলামি পরিবার বলে।

ইসলামী শরিয়ত সামনে রেখে রবের সমস্ত আদেশ ও নির্দেশ পালনের মাধ্যমে যে জীবন শুরু হয় এবং পরিবারের সকলেই মুসলমান হয় সেটাই হচ্ছে ইসলামী পরিবার।

পরিবার গঠনের মূল কাঠামো হলো বিয়ে ,বিয়ের জন্য প্রথমে পাত্র/পাত্রী নিবার্চন করতে হবে ইসলামী শরীয়ত মোতাবিক। আর এই নিবার্চন করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,সে ক্ষেথে অপনে শুধু স্ত্রী নির্বাচন করেছন না বরং একই সাথে আপনে একজন সন্তানের আর্দশ মা নিবার্চন করছেন। ইসলামী নির্দেশ মোতাবেক হচ্ছে-সৌন্দর্য্য ভালো বা সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন অথবা ইসলামী নির্দেশ পালনীয় হওয়া। উভয়ের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান আমল,চরিত্র,ইসলামী তাহজিব তামাদ্দুন,ধর্মীয় সংস্কৃতি

বিরাজমান থাকতে হবে। তাহলে এই পরিবারে আল্লাহর রহমত আসতে থাকবে,সাংসারিক সংঘাত দূর হবে এবং রাব্বে কারিম তাদেরকে হেফাজত করবেন।

রাব্বে কারিম ইরশাদ করেন-তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর থেকে তাঁর সহধর্মিণীও সৃজন করেছেন এবং এক জোড়া থেকে সর্বত্র পুরুষ ও নারীর বংশ পরস্পরায় বিস্তার লাভ করেছে। রাব্বে কারিম ইরশাদ করেন- নারীরা তোমাদের জন্য, তোমরাও তাদের জন্য। নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। মর্যাদার কারণ হলো যে, পুরুষ স্ত্রীদেরকে মোহর দান করে,তাদের যাবতীয় ভরণ পোষণ বহন করে,ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করে এবং শরিয়তের মৌলিক অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য তাকিদ দিয়ে থাকেন।

পুরুষরা স্ত্রীদের এমন ভাবে দেখাশুনা ও পরিচর্যা করেন,যেমন ভাবে শাসকগণ দেশের সাধারনের জন্য করে থাকেন।

(https://m.dailyinqilab.com/article/172224/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0)

পরিবার আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে অগ্নি হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর। যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মমহৃদয় কঠোরস্বভাব ফিরিস্তাগণের উপর। যারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা অমান্য করেনা এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। [কুরআন: ৬]

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে পরিবার বুঝাতে আল ও আহ্ল এবং ইয়াল শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। আল-মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির ‘আল’ হচ্ছে তার পরিবার-পরিজন, আর আহ্ল হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন ও স্ত্রী, ইয়াল অর্থ হচ্ছে

কোন ব্যক্তির ঘরের ঐ সকল অধিবাসী যাদের দায়-দায়িত্ব ঐ ব্যক্তি বহন করে। আরবীতে 'আল-উসরাহ' বলতেও পরিবার বুঝায়। ড. মাহমূদ আবদুর রহমান আব্দুল মুনঈম বলেন, ব্যক্তির পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দেরকে পরিবার বলে। দ্বিতীয়: পরিবারের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে 'আল-ফিকহুল মানহাজী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'ইসলামের দৃষ্টিতে পারিভাষিক অর্থে পরিবার বলতে বুঝায় বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের নিয়ে গঠিত জনসমষ্টিকে। [ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন, লেখক: মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম]

২।পরিবার –স্থায়ী সংস্থাঃ

পরিবার কি কোনো কৃত্রিম ও ইচ্ছানুক্রমে উদ্ভাবিত প্রতিষ্ঠান? তার কি অক্ষয় ও স্থায়ী হয়ে থাকা উচিত? তার কি একটি বিশ্বজনীন, সর্বদেশের ও সর্বকালের প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত নয়? বস্তুত মানব ইতিহাসের অতিপ্রাচীন কালেও এ পরিবারের অস্তিত্ব দেখা গেছে এবং মানুষ যদ্দিন এ ধরিত্রীর বুকে থাকবে, তদ্দিন পরিবার অবশ্যই টিকে থাকবে। কালের কুটিল গতি তাকে কিছুতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারবে না। প্লেটো থেকে এইচ.জি. ওয়েলস পর্যন্ত দার্শনিকদের প্রস্তাব অনুযায়ী সন্তান-সন্ততিকে বাপ-মার সংস্পর্শে ও নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা যেতে পারে বটে, কিন্তু এ পদ্ধতিতে সত্যিকার মানুষ তৈরীর জন্যে কোনো সফল প্রচেষ্টা আজো কার্যকর হতে দেখা যায়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিবার হচ্ছে এক স্থায়ী ও অক্ষয় মানবীয় সংস্থা (Human institution) এবং এর এই স্থিতিস্থাপকতার কারণ মানব প্রকৃতির গভীর সত্তায় নিহিত। অন্য কথায় পরিবার স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যবর্তী কোনো ক্ষণস্থায়ী যোগাযোগের ব্যাপারে আদৌ নয়। [পরিবার ও পারিবারিক জীবন, লেখক: মওলনা মোহাম্মাদ আব্দুর রহীম]

৩।পরিবার বিষয়ে প্লেটোর অভিমতঃ

দার্শনিক প্লেটো পরিবারকে একটি স্বাভাবিক (natural institution) বলে স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাঁর মতে পরিবারই হচ্ছে সমাজ জীবনের সব অনৈক্যের (Discord) মূলীভূত কারণ। কেননা এই পরিবারই মানুষকে শিক্ষা দেয়ঃ আমি ও তুমি, আমার ও তোমার। অতএব, তাঁর মতে পরিবার প্রথার উচ্ছেদই বাঞ্ছনীয়। তখন সব নারী-পুরুষ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীন ব্যারাকে বসবাস করবে এবং রাষ্ট্রকর্তাদের পর্যবেক্ষণাধীন শ্রেষ্ঠ নর শ্রেষ্ঠ নারীকে গ্রহণ করবে তাদের যৌন-লালসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে। তাদের এই যৌন মিলনের ফলে যখন কোনো নারীর সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তখন-তখনই সে সন্তানকে সরকারী নার্স অন্যত্র তুলে নিয়ে যাবে, যেন সে সন্তান তার পিতামাতাকে জানতে না পারে এবং পিতামাতাও যেন চিনতে না পারে তাদের ঔরসজাত –গর্ভজাত সন্তানকে। এরূপ কার্যক্রমের সর্বশেষ ফল দাঁড়াবে এই –এক দিনে প্রসূত সকল সন্তানকে সব বাবা-মায়ের নিজের সম্মিলিত সন্তান বলে মনে করতে থাকবে। আর কোনো পিতামাতা কোনো সন্তানকেই নিজের সন্তান বলে দাবি করার এবং অন্যদের থেকে পৃথক করে দেখবার সুযোগ পাবে না। এর ফলে রাষ্ট্র সর্ব দিক থেকেই সুরক্ষিত থাকতে পারবে। অন্যথায়, প্রত্যেকটি পরিবারের প্রয়োজন নির্বাহের জন্যে আলাদা আলাদা সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেবে এবং রাষ্ট্রের সমগ্র এলাকা 'আমার' ও 'তোমার' মধ্যে বণ্টিত ও খণ্ডিত হয়ে পড়বে। কিন্তু প্রস্তাবিত পন্থায় পরিবারও যেমন নির্ভুল হবে, তেমনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিও বিলুপ্ত হবে। আর এর দরুন সমাজের সব বিভেদ ও অনৈক্য বিদূরিত হবে এবং সব অসামঞ্জস্যও বিলীন হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত এর দরুন গোটা রাষ্ট্রই পরিণত হবে একটি মাত্র পরিবারে, আর সে পরিবারের সদস্যরূপে গণ্য হবে দেশের সমস্ত মানুষ। [পরিবার ও পারিবারিক জীবন, লেখক: মওলনা মোহাম্মাদ আব্দুর রহীম]

৪।পরিবারের অপরিহার্যতাঃ

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবারের মধ্যেই হয় মানুষের এ সামাজিক জীবনের সূচনা। মানুষ সকল যুগে ও সকল কালেই কোনো না কোনোভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীনতমকাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা প্রথম স্তর হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সোজা কথায় বলা যায়, বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের যে গুরুত্ব, প্রাচীনতম কালে মানুষের প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা যখন শুরু হয়েছিল, মানবতার সেই আদিম শৈশবকালে পরিবার ছিল সেই গুরুত্বের অধিকারী। বংশ ও পরিবার সংরক্ষণ এবং তার সাহায্য-সহায়তার লক্ষ্যে দুনিয়ার বড় বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে। উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনও চিরকাল সুনাম-সুখ্যাতি ও গৌরবের বিষয়রূপে গণ্য হয়ে এসেছে। আর নীচ বংশে ও নিকৃষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ বা আত্মীয়তা লাভ মানুষের হীনতা ও কলংকের চিহ্নরূপে গণ্য হয়েছে চিরকাল। যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের হেফাযত, উন্নতি বিধান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে, সে চিরকালই বংশের গৌরব, -Hero রূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে পরিবারস্থ প্রত্যেকটি মানুষের নিকট।

৫।পরিবারের ভিত্তিঃ

প্রাচীকাল থেকেই পরিবার দু'টি ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়ে এসেছে। একটি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি-নিহিত স্বভাবজাত প্রবণতা। এই প্রবণতার কারণেই মানুষ চিরকাল পরিবার গঠন করতে ও পারিবারিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং পরিবারহীন জীবনে মানুষ অনুভব করেছে বিরাট শূন্যতা ও জীবনের চরম অসম্পূর্ণতা। পরিবারহীন মানুষ নোঙরহীন নৌকা বা বৃন্তচ্যুত পত্রের মতোই স্থিতিহীন। আর দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে সমসাময়িককালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় পরিবার ছিল বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্র। সমাজ ও জাতি গঠনের জন্যে তা-ই ছিল একমাত্র উপায়। এ কারণে প্রাচীনকালের গোত্র ছিল অধিকতর প্রশস্ত; এতদূর প্রশস্ত যে, নামমাত্র রক্তের সম্পর্কেও বহু এক-

একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারত। এমন কি বাইরে থেকে যে লোকটিকে পরিবারের মধ্যে শামিল করে নেয়া হতো, তাকেও সকলেই উক্ত পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে নিত। পরিবারের নিজস্ব একান্ত আপন লোকদের জান-মাল ও ইজ্জতের যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো, সেই বাইরে থেকে আসা লোকটিরও হেফাযত করা হতো অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে। ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে 'মুতাবান্না' পালিত পুত্র গ্রহণের রীতি ছিল, একথা সর্বজনবিদিত। ইউরোপে এই সেদিন পর্যন্তও পালিত পুত্রকে আইন সম্মতভাবেই বংশোদ্ভূত সন্তানের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা হতো। রোমান সভ্যতার ইতিহাস এর চেয়েও অগ্রসর। সেখানে জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত পরিবারের অংশ বলে মনে করা হতো; মর্যাদা তার যত কমই হোক না কেন। এ থেকে এ সত্য জানতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিবারের পরিধি অধিকতর প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল। [ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন, লেখক: মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম]

৬।পারিবারিক জীবনের গুরুত্বঃ

ইসলাম পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও গতিশীল করার জন্য নানাবিধ বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে, যেগুলো পরিবারের প্রতি ইসলামের সীমাহীন গুরুত্বারোপের প্রমাণবাহী। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাধ্যমে এসব বিধি-বিধান মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। পরিবারের মূল ভিত্তি হলো বিয়ে। বিয়ের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে পরিবার। রচিত হয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী বলেন, The family which is the real unit of the human race and the first cohesive force which makes civilization possible, owes its existence solely to marriage. If there is no marriage, then there can be no family, no ties of kinship, no force uniting the different elements of humanity and consequently, no civilization. [ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন, লেখক: মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম]

তাই তো ইসলাম পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিয়ের নির্দেশ প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা যদি আশংকা কর যে, এতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে...।[সূরা আন নিসা, আয়াত: ৩]

আল্লাহ আরো বলেছেন, মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান কর বিয়ের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয়। [সূরা আল মায়িদা, আয়াত: ৫]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার সামর্থ রাখে সে যেন বিয়ে করে। কারণ তা দৃষ্টিকে সংবরণকারী এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণকারী। আর যে সক্ষম নয় তার সিয়াম পালন করা উচিত। কারণ তা তার জন্য কামস্পৃহা দমনকারী। তিনি আরো বলেন, বিয়ে করা আমার সুন্নাত। সুতরাং যে আমার সুন্নাত বর্জন করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিয়েকে ঈমানের অর্ধেক গণ্য করে বলেন, যখন কোন বান্দা বিয়ে করে তখন সে অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে। কাজেই অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে সে আল্লাহকে ভয় করুক।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। দেহের মধ্যে হার্ট বা কলবের স্থান যেমন, ইসলামে পরিবারের স্থান তেমন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শরীরের মধ্যে একটি গোশতপিন্ড রয়েছে। যদি তা সুস্থ-স্বাভাবিক থাকে তাহলে গোটা শরীর সুস্থ-স্বাভাবিক থাকে। আর যদি তা অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সমস্ত শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঐ গোশতপিন্ডটি হচ্ছে কলব বা হৃদয়। সুতরাং পরিবার যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে সমাজ ঠিক হয়ে যাবে। আর সমাজ ঠিক হয়ে গেলে রাষ্ট্রও ঠিক হয়ে যাবে। সেজন্য পরিবার ও পারিবারিক জীবনকে স্বর্গীয় আভায় আলোকিত করার লক্ষ্যে ইসলাম এতদসংক্রান্ত নানাবিধ দিকনির্দেশনা

প্রদান করেছে। পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাই এ বিষয়ে আমাদের আরো সতর্ক ও সাবধান হতে হবে। অন্যথা পাশ্চাত্যের মত আমাদেরকেও এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন!

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QJrbqdu2HYdWfKoyRoaUn8V8owtKsGqbo2ifPxBTo1cyY8Ab7XX5uPMtr2PuH9Vzl&id=448573402004082&mibextid=Nif5oz)

৭।পারিবারিক ব্যবস্থার ভাঙনঃ

দিন যতই যাচ্ছে, পারিবারিক সুখ-শান্তি আমাদের জীবন থেকে যোজন যোজন দূরে সরে যাচ্ছে। বৃদ্ধশ্রমের সংখ্যা বাড়ছে।

ডিভোর্স এখন মহামারিতে রূপ নিয়েছে আমাদের দেশে। পারিবারিক খুন-খারাবি এর আগে এতটা ভয়ংকর কখনোই হয়নি। পরকীয়ার বলি হচ্ছে সন্তান। স্বামীকে স্ত্রী আর স্ত্রীকে স্বামী খুন করছে অবলীলায়। বাড়ছে আত্মহত্যা।

মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন, যে সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, ওই সমাজে মাদক-আত্মহত্যা-পরকীয়া মহামারির মতো বেড়ে যায়।

ঢাকায় ঘণ্টায় এক তালাক, দিনে ৩৯ তালাক। কথাগুলো শুনে আমাদের আক্কেলগুড়ুম। এদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য বলছে, গত সাত বছরে তালাকের প্রবণতা ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। তালাক বা ডিভোর্স স্বাভাবিকভাবে নেতিবাচক বলেই এ নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা থাকবে। কিন্তু কোন সেই কারণ, যা আমাদের দুর্গতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে? বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ নিয়ে বহু মতামত হাজির করা হয়। তবু ভেবেছি এ নিয়ে কিছু লেখা দরকার। বিভিন্ন মিডিয়ায় তুলে ধরা হয়, নারীদের পক্ষ থেকে ডিভোর্সের প্রধান কারণ হলো স্বামীর সন্দেহবাতিক মনোভাব, পরনারীর সঙ্গে সম্পর্ক, যৌতুক, দেশের বাইরে গিয়ে আর ফিরে না আসা, মাদকাসক্তি,

ফেসবুকে আসক্তি, পুরুষত্বহীনতা, ব্যক্তিত্বের সংঘাত। আর পুরুষদের পক্ষ থেকে ডিভোর্সের প্রধান কারণ স্বামীর অবাধ্য হওয়া, ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী না চলা, বদমেজাজ, সংসারের প্রতি উদাসীনতা ও সন্তান না হওয়া। এই সাধারণ কারণগুলোর দিকে লক্ষ করলেই বোঝা যায় নারীদের পক্ষ থেকে অভিযোগের পাল্লা পুরুষদের তুলনায় অনেক ভারী। সেদিক বিবেচনায় নারীদের পক্ষ থেকে ৭০ শতাংশ আর পুরুষদের পক্ষ থেকে ৩০ শতাংশ ডিভোর্সের যৌক্তিকতা উড়িয়ে দেয়া যায় না। প্রকৃতিগতভাবেই নারী পরিবারবান্ধব, সে কারণে এ চিত্র প্রাকৃতিক চরিত্রের অনেকটাই বিপরীতে অবস্থান করে। আবার এও দেখা যায়, শিক্ষিতদের মধ্যে এ হার অশিক্ষিতদের তুলনায় অনেক বেশি, আর্থিক অসচ্ছলদের তুলনায় সচ্ছলদের মধ্যে ডিভোর্সের হার আরো বেশি। এর মানে শিক্ষা আর অর্থসম্পদ দিয়ে সংসার টেকানো যাচ্ছে না। সে কারণেই এর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অতিজরুরি হয়ে পড়েছে।

ডিভোর্সের মাত্রা বৃদ্ধির পেছনে যে কারণগুলো উঠে আসে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পুরুষতান্ত্রিকতা, নারীবাদী প্রবণতা, আধুনিকতা ও প্রযুক্তির বিশ্বায়ন। এর মানে একটা জটিলতার মধ্য দিয়ে মানুষের পারিবারিক জীবন চলছে। সহজ ভাষায়, জটিলতাই ডিভোর্সের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলছে। সেই আদিম অকৃত্রিম পরিবার ব্যবস্থা সহজেই চোখে পড়ে না। কোন সেই কারণ, যা পারিবারিক জীবনযাত্রাকে জটিল করেছে? আমার মনে হয়, বিয়ে বা পরিবার নামের প্রতিষ্ঠান গঠনের দুর্বল ভিত্তিই বিবাহবিচ্ছেদ বা পরিবার ভাঙনের অন্যতম কারণ।

বিয়ে বা পরিবার গঠনের ভিত্তি নিয়ে দুটো জনপ্রিয় তত্ত্ব রয়েছে। ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের মতে, অর্থনীতিই পরিবার বা বিয়ে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ভিত্তি। এ তত্ত্বে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অবাধ যৌনাচার রহিত হয়ে যায়, গড়ে ওঠে স্থায়ী পরিবার ব্যবস্থা। আর এই পরিবার ব্যবস্থায় পুরুষতন্ত্র পেয়ে যায় শক্ত আসন, যাকে তিনি বলেছেন নারী জাতির ঐতিহাসিক পরাজয়। সম্পত্তির মালিকানাই যদি পরিবার ব্যবস্থার একমাত্র ভিত্তি হয়, তাহলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোই সবচেয়ে বেশি টেকসই হতো। অথচ আমরা দেখতে পাই যারা দিন

আনে দিন খায়, তাদের চেয়ে ওইসব পরিবার ভেঙে খান খান হয়ে যায়, যাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ অনেক অনেক বেশি। বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ আমেরিকা, অথচ এ দেশে ডিভোর্সের হার ইউরোপ ও শিল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি (Davis ১৯৮৫, Lye ১৯৮৮)। আমাদের দেশে জিডিপি বাড়ছে, মানুষের আয় বাড়ছে, অথচ দুর্বল হয়ে পড়ছে পরিবার কাঠামো। অর্থনীতি যদি পরিবার কাঠামোর প্রধান ভিত্তি হয়, তাহলে কেন বহু সচ্ছল পরিবারের সম্পর্কগুলো বিবাহবিচ্ছেদে পরিণত হচ্ছে, যেখানে উল্টো হওয়ার কথা ছিল।

অন্যদিকে শারীরবৃত্তীয় তত্ত্ব থেকে বলা হয়, মানুষ যৌন চাহিদা পূরণের নিমিত্তে আর যৌন নিরাপত্তার খাতিরে পরিবার ব্যবস্থা চালু রাখে। যৌন নিরাপত্তাই যদি বিবাহ ও পরিবার প্রথার ভিত্তিমূল হয়, তাতে বিবাহবিচ্ছেদ এক স্বাভাবিক ব্যাপার হবে অনায়াসেই। ফ্রয়েডীয় ধারণা এই যে মানুষ যৌন কামনা-বাসনাপ্রবণ এমন এক জীব, যে কিনা ব্যক্তিক আনন্দ, বিনোদনে কাটাতে চায়, যে কিনা চায় শুধুই নিজের সুখ নিজের শান্তি; বরং সমাজের এমনকি ধর্মের আরোপিত বিধি-নিষেধ মানতে চায় না প্রবৃত্তিপ্রবণ এই মানুষেরা। মানুষ যদি নিজেকে শারীরবৃত্তীয় সত্তাই মনে করে, তাহলে সে কেমন করে পরিবার কাঠামোকে টিকিয়ে রাখবে? শরীরই যদি তাকে পরিচালিত করে, সে কী করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে? এ কারণে বিয়ের আগে কামনাপ্রবণ প্রেম-সম্পর্ক আর বিয়ের পরে পরকীয়ায় আসক্তি—এসবই কামনার দুরন্তপনাকে ইঙ্গিত করে। এর মানে অর্থনীতি বা যৌনতা কোনোটাই বিয়ে বা পরিবার কাঠামোর ভিত্তি হতে পারে না।

কেউ কেউ বলছে, আধুনিকতাই ডিভোর্সের হার বৃদ্ধির অন্যতম খলনায়ক। প্রচলিত আধুনিকতাকে আমি চারটি উপাদানে বুঝতে চাই—এক. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (formal education) দুই. ব্যক্তিবাদ (individualism) তিন. পুঁজিবাদ capitalism) চার. মিডিয়া প্রযুক্তি। পরিসংখ্যানে দেখতে পাই নারী ও পুরুষের মধ্যে যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সনদ পেয়েছে, তাদের মধ্যে ডিভোর্সের হার অত্যধিক। কারণ তাদের শিক্ষা তাদের চাকরি দিয়েছে, কামনা-বাসনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে, অহংকে আরো

বাড়িয়ে তুলেছে। এই শিক্ষা পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য শক্তিশালী এক পুঁজি, কিন্তু এটা এমন কোনো মূল্যবোধ শেখাতে পারেনি, যাতে মানুষ সততা আর নিষ্ঠার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক উন্নত করতে পারবে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিবাদ। নারী ও পুরুষ উভয়ই ব্যক্তিবাদী হয়ে উঠেছে চরম আকারে। হয়তো তাদের মধ্যে একসময় প্রেম ছিল, ভেবেছিল একজন ছাড়া আরেকজন বাঁচতেই পারবে না। অথচ পারিবারিক জীবনে আয় উপার্জন বাড়ানো আর ক্যারিয়ারমুখিতা এতই প্রকট হয় যে তাদের দুজনের আগের সেই প্রেম দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। পারিবারিক সম্পর্কে পুরুষের মাঝে কাজ করে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, নারীর মধ্যে কাজ করে সেই নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে স্বাধীন হওয়ার প্রবণতা। এই দুই প্রবণতার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেই তারা তাদের প্রেমকে ভুলে যায়, ভুলে যায় একে অন্যের প্রতি দায়িত্বশীলতা, কমে যায় নিজ সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।

দুর্বল সম্পর্ককে আরো দুর্বল করতে হাজির হয় আধুনিকতার আরেক শক্তি 'মিডিয়া প্রযুক্তি', আমরা একে বলতে পারি 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। ইন্টারনেট স্মার্টফোনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মা-বাবা ও সন্তানদের জীবনের ওপর এত বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় যে যেন স্মার্টফোন পুরো পরিবারের কর্তা। স্মার্টফোনের কর্তৃত্ব এমনই প্রবল হতে শুরু করে, প্রত্যেকে নিজেকে উড়াল পাখির মতো স্বাধীন মনে করে। ক্যাসেলস এ কারণে এর নাম দিয়েছেন স্বাধীনতার প্রযুক্তি। এই স্বাধীনতা এমনই উদ্ভ্রান্ত যে দ্রুততার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়ানো সহজ হয়ে গেছে। পরকীয়ায় জড়ানোর চেষ্টা অথবা স্বাভাবিক আলাপচারিতা দাম্পত্য জীবনে একে অন্যের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। এদের প্রেম সম্পর্ক এতই দুর্বল যে সন্দেহ-ভুল বোঝাবুঝি আর কলহ নিত্যদিনের সাথী হয়ে যায়। বিয়ের আগে বলছিল, 'সুখের সাগরে ঢেউ খেলে চলো দুজনে এক সাথে ভেসে যাই', অথচ দাম্পত্য জীবন তাদের কাছে যেন কণ্টকাকীর্ণ বিছানা, সাগরে তারা আর আগের মতো ভাসে না, ডুবে যেতে চলছে তাদের প্রেম, তাদের সম্পর্ক। এর স্বাভাবিক দায় প্রযুক্তিকে দেয়া হলেও মূল কারণ সম্পর্কের ভিত্তিমূল। উলরিচ বেক (১৯৯৫) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'the common ground is exclusively emotional'। সত্যিকার অর্থে

চলমান ‘আবেগসূচক প্রেম’ (বেক, ১৯৯৫), আত্মতৃপ্তির অনুসন্ধান (ডেজলার, ১৯৮০), ব্যক্তিগত সুবিধার তাড়না (সুইডলার১৯৮০) মানুষের দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিয়েছে।

অথচ এসবই ব্যক্তিবাদের চেতনা থেকে এসেছে। ব্যক্তিবাদের এই চেতনায় মানুষ হারিয়ে ফেলে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি, আসক্ত হয় পরকীয়ায়, ক্যারিয়ারের মাঝে মর্যাদা খুঁজে, আর হোটেল-বারে আনাগোনা বাড়তে থাকে। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো সেই সুযোগ-সুবিধা উন্মুুক্ত করে দিয়েছে। চরিত্রের সীমা লঙ্ঘন করা, পরিবারের প্রতি উদাসীন থাকা, সন্তানকে চাইল্ড কেয়ারে দিয়ে ফুর্তি-মাস্তিতে সময় কাটানো মানে এদের কাছে আধুনিকতা। আধুনিকতার অর্থ যদি সর্বজনীনতা হয়, এর অর্থ মানবিকতা হয়; তাহলে বলতেই হবে প্রচলিত আধুনিকতা মানুষকে ক্যারিয়ারমুখী করেছে, স্বাধীনতার পুঁজিবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে, অথচ পরিবার ও বিয়ে নামক জাতি গঠনের ভিত্তিকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। এর চেয়ে বড় অমানবিকতা আর কী আছে?

প্রকৃত আধুনিকতা এখনো আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমরা যদি আমাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান না পাই, আমরা যদি বুঝতে না পারি আমাদের জীবনীশক্তির শিকড়; আমরা হতে থাকব উদাসীন, আবেগসর্বস্ব প্রেমিক, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও কামনাপ্রবণ। ফলে ভেঙে পড়ছে পরিবার কাঠামো। পরিবার আসলেই দায়িত্বপালনের সেন্টার, ভালোবাসা আর মমতার উত্তম স্থান। সততা, দায়িত্বশীলতা আর ত্যাগের মধ্য দিয়েই আমরা বিয়ে ও পরিবারের শক্ত ভিত দাঁড় করাতে পারব। আয় উপার্জন আর যৌনতা হলো পরিবার ব্যবস্থা সক্রিয় রাখার উপায় মাত্র। আমাদের খুঁজতে হবে এই ভিত্তিমূলের উৎস কোথায়?

(ড. আশেক মাহমুদ: সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

৮।পরিবারই শিশুর প্রথম বিদ্যালয়ঃ

জন্মের পর একটি শিশু বাড়িতে তার পরিবারের সাথে বেড়ে ওঠে। বলতে গেলে পরিবারের মাধ্যমে সে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারই প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে। শিশুর সকল শিক্ষার হাতেখড়ি তার বাড়িতেই হয়। বাড়ি শিশুর প্রথম আর প্রধান শিক্ষালয় এবং পরিবারের সদস্যরা হলেন শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষাগুরু। তাই শিক্ষাগুরুকে তার শিষ্যকে সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে হবে। পারিবারিক শিক্ষাই একটি শিশুর ভবিষ্যৎ মানসিক গঠনে প্রভাব রাখে। তাই শিশুর সামাজিক গঠনে বাড়ির সদস্যদের বিশেষ নজর দিতে হবে।

বাড়ির সদস্যদের কাছ থেকে শিশু যে শিক্ষা পায় তা তাকে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। আর পরিবারের ভঙ্গুর শিক্ষা শিশুর পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করে। সুতরাং শিশুর বিকাশে বাড়ি থেকে সঠিক শিক্ষাটা আসা অত্যন্ত জরুরি। শিশুকে সঠিকভাবে সামাজিক গড়ে তুলতে পারলেই তার সঠিক বিকাশ সম্ভব। এছাড়া পরিবারেই মানবিক গুণাবলির বীজ বপন হয়ে থাকে। তাই শিশুর মানবিক গুণাবলি গঠনেও পরিবার বিশেষ করে মা-বাবার অনেক অবদান রয়েছে। পারিবারিক নিয়ম, শৃঙ্খলা, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, অনুপ্রেরণার মাধ্যমেই একজন শিশু সমাজে প্রত্যাশিত আচরণ করতে শেখে।

বাড়ির সকল সদস্যরা সমাজ ও সামাজিক অভ্যাসকে শিশুর কাছে পরিচিত করে তোলে। আমাদের আচরণ, অভ্যাস, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি পারিবারিক শিক্ষারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। গবেষণায় দেখা গেছে, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার দিন থেকে শুরু করে স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রথম দিন পর্যন্ত শিশুর যে বিকাশ হয়, তা জীবনের অন্য যেকোনো পর্যায়ের থেকে বেশি। এই সময়ে শিশু যদি তার বাড়ি থেকে ইতিবাচক শিক্ষা না পায় তাহলে তার বিকাশ সঠিকভাবে ঘটবেনা। ভবিষ্যতে তাকে যেমন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে ঠিক তেমনি সে নিজেও অন্যের সমস্যার কারণ হতে পারে। সমাজে যেকোনো অপরাধ পারিবারিক সঠিক শিক্ষার অভাবেই সংঘটিত হয়।

মার ডিভোর্সের কারণে একটি শিশুকে সামাজিক হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়। এতে করে তার মনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে।

আবার যেসব পরিবারে ঝগড়া-ঝাটি, হানাহানি, বিদ্বেষ এসব বেশি থাকে সেসব পরিবারের শিশুদের বিকাশ সঠিকভাবে হয় না। আর এইসব পরিবারের শিশুদের সামাজিক মূল্যবোধের মত তাৎপর্যপূর্ণ গুণাবলিও গড়ে ওঠে না। আর এরাই সমাজে বিশৃঙ্খলা ও হানাহানির সৃষ্টি করে। তাই, আমাদের মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পেছনেও আমাদের বাবা-মার ভূমিকা রয়েছে। আরেকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো দ্বীনি শিক্ষা। আমাদের দ্বীন ইসলামে শিশুর জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত বিষয় অত্যান্ত চমৎকারভাবে বর্নিত আছে যা অন্য কোন ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থায় নেই।ইসলামিক তারবিয়াহ একটি শিশুকে সকল অপরাধ ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেয়।

এক্ষেত্রে বাড়ির সদস্যদের মধ্যে দ্বীনি নৈতিকতা ও আদবকায়দার চর্চা না থাকলে শিশুটিও এই গুণগুলোতে অভ্যস্ত হতে পারবেনা। তাই বাড়িতে থেকে শৈশবেই শিশুকে এসব আদবকায়দার শিক্ষা দিতে হবে। আবার আদর ও শাসনের ভারসাম্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতি আদর শিশুকে নষ্ট করে দিতে পারে। আবার শাসনের বাড়াবাড়িতে শিশু বখে যেতে পারে। সুতরাং শিশুর মানবিক গঠনে বাড়ির সদস্যদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে হবে।

একজন মানুষের জীবনে বাড়ি বা পরিবার হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। আর সেই বিদ্যালয়ের দক্ষ এবং একনিষ্ঠ শিক্ষক আমাদের বাবা-মা। তাদের সঠিক নির্দেশনাতেই একটি শিশু সমাজে বসবাস করার যোগ্য সঠিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। বড়ি সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হলেও জাতি গঠনে এটি সুদূরপ্রসারী অবদান রাখে। সুতরাং বাড়ির সকল সদস্যদের একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে শিশুকে সঠিক শিক্ষা দিতে হবে।

(https://www.ittefaq.com.bd/492018/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%C2%A0)

৯।পরিবারের প্রতি দায়িত্বঃ

পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন কিংবা পরিবারের ব্যয়ভার বহন, ভরণ-পোষণ দেয়া বাধ্যতামূল। ইসলামে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব। দুনিয়া ও পরকালের সব বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের প্রতি যত্ন নিতে কিংবা অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখতে কুরআন সুন্নায় সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

‘হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেরা বাঁচ এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর। সেই অগ্নি থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।’ (সুরা তাহরিম : আয়াত ৬)

দুনিয়ায় পরিবারের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্যই মহান আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করেছেন। এর মধ্যে দুনিয়া ও পরকালের সব দায়িত্ব পালনের বিষয়ই জড়িত। আর দুনিয়ার সব কাজই পরকালের জন্য উত্তম পাথেয়। হাদিসের বর্ণনায় পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের বিষয়গুলো ওঠে এসেছে।

হাদিসে এসেছে-

- হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘উত্তম সাদকা হলো যা দান করার পর মানুষ অমুখাপেক্ষী থাকে। নিচের হাত থেকে উপরের হাত উত্তম। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদের আগে দাও। (কেননা) স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও, নতুবা তালাক্ব দাও। গোলাম বলবে, খাবার দাও এবং কাজ করাও। ছেলে বলবে আমাকে খাবার দাও। আমাকে তুমি কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছ? লোকেরা জিজ্ঞাস করল হে আবু হুরায়রা! আপনি কি এ হাদিস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বলবেন, এটি আবু হুরায়রার থলে থেকে (পাওয়া) নয়, (বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে)। (বুখারি)

- হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উত্তম দান তা-ই যা দিয়ে মানুষ অভাবমুক্ত থাকে। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে তাদের থেকে শুরু কর। (বুখারি)

সুতরাং হাদিসের দিকনির্দেশনা হলো-

- প্রথমেই পরিবার পরিজনের চাহিদা মেটানো। যাতে তারা সব সময় অভাবমুক্ত থাকে। যা পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব।

- মৃত্যুর সময় ওয়ারিশদেরকে স্বচ্চল অবস্থায় রেখে যাওয়া। যাতে করে অভিভাবকের মৃত্যুর পর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

- প্রত্যেক দানই সাদকার ছাওয়াব লাভ হয়। সুতরাং সাদকা তথা দান-অনুদান প্রদান করা সুন্নাত।

- সর্বোত্তম দান হচ্ছে, যে পরিমান সম্পদ দান করলে মানুষ অভাবমুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয়।

বিশেষে করে এমনভাবে পরিবারকে রেখে যাওয়া, যদি পরিবারের প্রত্যেক সদস্য দুনিয়ায় যেমন থাকবে স্বচ্ছল তেমনি পরকালের জবাবদিহীতায়ও থাকবে স্বচ্ছ।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কুরআনের নির্দেশনা ও হাদিসের ওপর যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। পারিবারের প্রতি দুনিয়া ও পরকালের হক যথাযথ আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

(https://www.jagonews24.com/religion/article/627153)

১০। পারিবারিক বন্ধন, ঈমান ও তাকওয়াঃ

যে সব খুঁটির উপর মুসলিম পরিবার দাঁড়িয়ে থাকে, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: ঈমানের রশিকে শক্তভাবে আকড়ে ধরা ... আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান; অন্তর যা লুকিয়ে রাখে, সে বস্তু সম্পর্কে যিনি জানেন তাকে ভয় করা; তাকওয়া ও আত্মপর্যবেক্ষণকে অপরিহার্য করে নেয়া; আর যুলুম থেকে এবং সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া থেকে দূরে থাকা। আল-কুরআনের ভাষায়:

﴿ ... ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢
وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ ...٣ ﴾ [الطلاق :٢، ٣]

" ... এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন, আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযিক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ..." - (সূরা আত-তালাক, আয়াত: ২ - ৩)।

আর এই ঈমানকে শক্তিশালী করবে: আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের ব্যাপারে চেষ্টা করা, তার ব্যাপারে যত্নবান থাকা এবং সে ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরকে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করা;

তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীটি নিয়ে ভেবে দেখ, তিনি বলেছেন:

رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت ,فإن أبت نضح في وجهها » الماء)يعني :رش عليها الماء رشا رفيقا , (ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى ,فإن أبى نضحت في وجهه الماء « .)رواه أحمد و أبو داود و النسائي و ابن ماجه) .

“আল্লাহ রহম করুন এমন পুরুষ ব্যক্তির প্রতি, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে উঠে, অতঃপর সালাত আদায় করে এবং সে তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়, তারপর সেও সালাত আদায় করে; অতঃপর সে (স্ত্রী) যদি ঘুম থেকে উঠতে আপত্তি করে, তাহলে তার মুখমণ্ডলের উপর হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে দেয়। আর আল্লাহ রহম করুন এমন নারীর প্রতি, যে রাতে ঘুম থেকে উঠে, অতঃপর সালাত আদায় করে এবং সে তার স্বামীকে জাগিয়ে দেয়, তারপর সেও সালাত আদায় করে; অতঃপর সে (স্বামী) যদি ঘুম থেকে উঠতে আপত্তি করে, তাহলে তার মুখমণ্ডলের উপর হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে দেয়।”[1]

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কটি পার্থিব ও বস্তুগত কোনো সম্পর্ক নয়; নয় চতুষ্পদ জন্তুর প্রবৃত্তির মত কোনো সম্পর্ক; বরং তা হল আত্মীক ও সম্মানজনক একটি সম্পর্ক; আর যখন এই সম্পর্কটি নির্ভেজাল ও যথাযথ হবে, তখন তা মৃত্যুর পর পরকালীন জীবন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে; আল-কুরআনের ভাষায়:

﴿ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ ﴾ [الرعد :٢٣]

“স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও।” - (সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৩)।

২. সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন-যাপন করা: যে জিনিসটি এ পবিত্র দাম্পত্য সম্পর্ককে হেফাযত ও তত্ত্বাবধান করে, তা হল পরস্পর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন-যাপন করা; আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হবে না, যতক্ষণ না প্রত্যেক পক্ষ তার ভাল-মন্দ সম্পর্কে বুঝতে পারবে। বস্তুত ঘর ও পরিবারের ব্যাপারে সার্বিক পূর্ণতার বিষয়টি

সুদূর পরাহত, তাই পরিবারের সদস্য কিংবা অন্যদের মধ্যে সকল বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা লাভ করার আশা করাটা মানব স্বভাবে নাগালের বাইরের বিষয়।

[1] হাদিসটি সহীহ, যা বর্ণনা করেছেন: আহমদ, আল-মুসনাদ: ২/২৫০, ৪৩৬; আবূ দাউদ: ১৩০৮; নাসায়ী: ৩/২০৫; ইবনু মাজাহ: ১৩৩৬; আর ইবনু খুযাইমা হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন (১১৪৮); হাকেম: ১/৩০৯; আর যাহাবী র. তা সমর্থন করেছেন।(https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=120&section=1585)

১০।বিয়ে>পরিবার গঠন > দ্বীনের পূর্নাঙ্গতাঃ

বিয়ে মহান আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ এক নেয়ামত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। ঈমানের পূর্ণতার সহায়ক। চারিত্রিক আত্মরক্ষার অনন্য হাতিয়ার। আদর্শ পরিবার গঠন, জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং মানসিক প্রশান্তি লাভের প্রধান উপকরণ।

প্রাপ্ত বয়স্ক ও সামর্থ্যবান হলে— কালবিলম্ব না করে বিয়ে করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। বিয়ে শুধু জৈবিক চাহিদাই নয়, বরং একটি মহান ইবাদতও বটে। বিয়ের মাধ্যমে ইহ ও পরকালীন কল্যাণ সাধিত হয়। বিয়ে মানুষের জীবন পরিশীলিত, মার্জিত ও পবিত্র করে তোলে।

পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবীর বিয়ে

বিয়ের বিধান সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকেই পালন হয়ে আসছে। আদর্শ পরিবার গঠন, জৈবিক চাহিদা পূরণ, মানসিক প্রশান্তি ও বংশ বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম হলো বিয়ে। বিয়ে প্রতিটি মানুষের স্বভাবজাত চাহিদাও পূরণ করে। এ চাহিদা পূরণার্থেই ইসলাম শরিয়ত বিয়ের বিষয়াদি সহজ করেছে।

পৃথিবীর আদিমানুষ আদম (আ.)। তখনো আদি মানবীর সৃষ্টি হয়নি। আদম আল্লাহর নির্দেশে জান্নাতের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। ফুলের সৌরভ, পাখির কলরব ও নদীর কলকল সুর— আদমের মনে হিল্লোল বইয়ে দেয়। কিন্তু সে হিল্লোল বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মনো-তটে আনন্দ আছড়ে পড়ে— আবার তা মিলিয়ে যায়, বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ধীরে ধীরে আদম বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। সবকিছু থেকেও যেন তার কিছু একটা নেই। আল্লাহ বুঝতে পারলেন আদমের সঙ্গীর অভাব। তিনি সৃষ্টির করলেন— এক রূপবতী রমণীকে। যিনি পৃথিবীর প্রথম নারী। নাম তার হাওয়া। আমাদের আদিমাতা হাওয়া (আ.)।

আদম (আ.) তার সঙ্গীনি হাওয়াকে দেখে-ই বিস্ময়ে হতবাক। সঙ্গ চাইলেন এই রূপবতীর। আল্লাহ তাআলা আখেরি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর দরুদ পড়াকে মোহরানা নির্ধারণ করেন। আর আদমের সঙ্গে হাওয়ার বিয়ে সম্পন্ন করে দেন। শুরু হয় প্রথম মানব-মানবীর পবিত্র বন্ধন— বৈবাহিক জীবনের। তারা সন্তান জন্ম দিয়ে হলেন পৃথিবীর আদিপিতা ও আদিমাতা। একপর্যায়ে তাদের সন্তানসন্ততি হয়। মানব বংশের বিস্তার ঘটে। আর এভাবেই বিয়ের মাধ্যমে মানবসভ্যতার যাত্রা শুরু হয়।

মহান রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন, 'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।' (সুরা রুম, আয়াত : ২১)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিয়ে সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা বিয়েতে সামর্থ্য নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে— যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেন। (সুরা নুর, আয়াত : ৩২-৩৩)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন, ‘ ইরশাদ করেন- هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ অর্থাৎ ‘তারা (

স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাদের পোশাকস্বরূপ`। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৭)

যারা বিয়ে করে না, তাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন রাসুল (সা.)। হাদিসে আছে, তিনজন ব্যক্তি আল্লাহ রাসুল (সা.)-এর ঘরে আসলেন। তারা ঘরবাসীদের রাসুল (সা.)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তার ইবাদতের কথা শুনে তারা যেন বলল, কোথায় আল্লাহ রাসুল (সা.) আর কোথায় আমরা? তার আগের ও পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তাদের একজন বলল, আমি সারাজীবন রাতভর ইবাদত করব। আরেকজন বলল, আমি আজীবন রোজা রাখব। কখনো রোজা ভাঙব না। অন্যজন বলল, আমি নারীদের থেকে দূরে থাকব; কখনো বিয়ে করব না। আল্লাহর রাসুল তখন (সা.) তাদের কাছে এসে বললেন, ‘আরে! তোমরা এমন-অমন বলছো না! অথচ আমি তোমাদের সবার চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি। কিন্তু আমি রোজা রাখি, আবার ইফতারও করি। নামাজ পড়ি, আবার ঘুমও যাই। নারীকে বিয়েও করি করি। অতএব, যারা আমার সুন্নত ছেড়ে দেবে, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।’ (বুখারি, হাদিস : ৫০৬৩; মুসলিম, হাদিস :)

বিয়ে মহান আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ এক নেয়ামত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। ঈমানের পূর্ণতার সহায়ক। চারিত্রিক আত্মরক্ষার অনন্য হাতিয়ার। আদর্শ পরিবার গঠন, জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং মানসিক প্রশান্তি লাভের প্রধান উপকরণ।

প্রাপ্ত বয়স্ক ও সামর্থ্যবান হলে— কালবিলম্ব না করে বিয়ে করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। বিয়ে শুধু জৈবিক চাহিদাই নয়, বরং একটি মহান ইবাদতও বটে। বিয়ের মাধ্যমে ইহ ও পরকালীন কল্যাণ সাধিত হয়। বিয়ে মানুষের জীবন পরিশীলিত, মার্জিত ও পবিত্র করে তোলে।

আর্থিক সচ্ছলতা লাভে বিয়ে-শাদি

মহান রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন, ‘আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।’ (সুরা রুম, আয়াত : ২১)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিয়ে সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা বিয়েতে সামর্থ্য নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে— যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেন। (সুরা নুর, আয়াত : ৩২-৩৩)

আরও পড়ুন : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন, ‘ ইরশাদ করেন- هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ অর্থাৎ ‘তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাদের পোশাকস্বরূপ`। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৭)

যারা বিয়ে করে না— তাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি

যারা বিয়ে করে না, তাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন রাসুল (সা.)। হাদিসে আছে, তিনজন ব্যক্তি আল্লাহ রাসুল (সা.)-এর ঘরে আসলেন। তারা ঘরবাসীদের রাসুল (সা.)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তার ইবাদতের কথা শুনে তারা যেন বলল, কোথায় আল্লাহ রাসুল (সা.) আর কোথায় আমরা? তার আগের ও পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তাদের একজন বলল, আমি সারাজীবন রাতভর ইবাদত করব। আরেকজন বলল, আমি আজীবন রোজা রাখব। কখনো রোজা ভাঙব

না। অন্যজন বলল, আমি নারীদের থেকে দূরে থাকব; কখনো বিয়ে করব না। আল্লাহর রাসুল তখন (সা.) তাদের কাছে এসে বললেন, ‘আরে! তোমরা এমন-অমন বলছো না! অথচ আমি তোমাদের সবার চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি। কিন্তু আমি রোজা রাখি, আবার ইফতারও করি। নামাজ পড়ি, আবার ঘুমও যাই। নারীকে বিয়েও করি করি। অতএব, যারা আমার সুন্নত ছেড়ে দেবে, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।’ (বুখারি, হাদিস : ৫০৬৩; মুসলিম, হাদিস : ১৪০১)

সক্ষমতা থাকলে দ্রুত বিয়ে করা আবশ্যক

আল্লাহর রাসুল (সা.) আরও বলেন, ‘হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়, কেননা তা চক্ষুকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান রক্ষা করে। (বুখারি, হাদিস : ৫০৬৬; মুসলিম, হাদিস : ১৪০০)

রাসুল (সা.) আরও বলেন, ‘যখন বান্দা বিয়ে করে, তখন সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূরণ করে। অতএব, বাকি অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।’ (সহিহ আল-জামিউস সাগির ওয়া জিয়াদাতুহু, হাদিস : ৬১৪৮; তাবরানি, হাদিস : ৯৭২; মুসতাদরাক হাকিম, হাদিস : ২৭২৮)

ইসলামে বিয়ের ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেওয়ার পরও অনেক সময় অর্থ-সংকটের কথিত অজুহাতে পিতামাতারা ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দিতে গড়িমসি করেন। আবার অনেক যুবক-যুবতীও ক্যারিয়ারের কথা বলে— বিয়ে করতে টালবাহানা করেন। তারা মনে করে, বিয়ে করলে হয়ত আর্থিক-সংকট বেড়ে যাবে। আর এ দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বা আরও বেশি অর্থ উপার্জনের সুযোগ না হলে— জীবনমান নিচে নেমে যাবে; কিংবা জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে। অথচ তাদের এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা শরিয়তের আলোকে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এসব চিন্তা সঠিক বলে ধর্তব্য নয়। কেননা মানুষের আয়-রোজগার স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় কোনো বিষয় নয়।

যে আল্লাহ আজ একজনকে ৫০ টাকা দিচ্ছেন, সে আল্লাহ-ই আগামীকাল তাকে ১০০ টাকা দিতে পারেন।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আছে, তিনি বলেন- আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তিন প্রকারের মানুষকে সাহায্য করা— আল্লাহ তাআলা নিজের কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এক. আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদকারী। দুই. মুকাতাব গোলাম- যে চুক্তির অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা করে। তিন. বিয়ে আগ্রহী— যে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৫১৮)(https://www.dhakapost.com/religion/67268)

১২। পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ

মানুষ যত প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে থাকুক না কেন, যদি তাদের পাশে কোনো আত্মীয় না থাকে, তারা সর্বদা হতাশায় ভোগে। তাই পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। এবং সেখানে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারীদের বিবেকবান বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে, '(তারাই বিবেকবান) আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ দিয়েছেন, যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে এবং তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, আর ভয় করে কঠোর হিসাবকে।(সুরা : রাদ, আয়াত : ২১)

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, বিবেকবান ঈমানদাররা আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান হয়। পাশাপাশি তারা সার্বিক বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে। এই ভয় উৎসারিত হয় সম্মান, জ্ঞান, ভক্তি ও ভালোবাসা থেকে। তাদের কাছে প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই মুখ্য হয়ে থাকে।

বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অনুকূল-প্রতিকূল সব পরিস্থিতিতে পরকালের জবাবদিহির ভয় করে। আল্লাহর ভয় এবং পরকালে জবাবদিহির ভয় মানুষকে বিশ্বাস ও বিবেক নির্দেশিত পথে পরিচালিত করে।

এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের দুনিয়া-আখিরাতে যেমন সম্মানী করেন, তেমনি তাদের হায়াত ও রিজিকেও বরকত দান করেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, 'আমি নবী করিম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার রিজিক প্রশস্ত ও আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।' (বুখারি, হাদিস : ৫৫৫৯)

যারা তাদের আত্মীয়দের খোঁজখবর রাখে না, তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করে না।

তাদের হক আদায় করে না। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছেন রাসুল (সা.)। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, আত্মীয়তার হক রহমানের মূল। যে তা সংরক্ষণ করবে, আমি তাকে সংরক্ষণ করব। আর যে তা ছিন্ন করবে, আমি তাকে (আমার হতে) ছিন্ন করব। (বুখারি, হাদিস : ৫৯৮৯)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'জ্ঞাতিবন্ধন আরশে ঝুলন্ত আছে এবং সে বলছে, যে আমাকে অবিচ্ছিন্ন রাখবে, আল্লাহ তার সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন রাখবেন। আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবেন।' (রিয়াদুস সালেহিন, হাদিস : ৩২৮)

জার্নাল অব ফ্যামিলি সাইকোলজিতে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের পারিবারিক বন্ধন বেশ শক্তিশালী, তারা তুলনামূলকভাবে রোগে কম আক্রান্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে পরিবারের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক খারাপ, তারা বেশি মাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বয়স্ক লোকদের মধ্যে যারা রোগাক্রান্ত, তাদের পারিবারিক ইতিহাস খুঁজে দেখা গেছে, প্রত্যেকেই পরিবারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করছেন না।

সমীক্ষাটির প্রধান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের সহযোগী অধ্যাপক সারারাহ বি উডস বলেন, আমরা দেখেছি পরিবারের আবেগঘন পরিবেশ ব্যক্তির স্বাস্থ্যে

ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া ২০ বছর পার হয়ে যাওয়ার পর তার স্ট্রোক হতে পারে এবং এটি মাথা ব্যথায়ও প্রভাব ফেলে।

আমাদের উচিত, আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকে আরো শক্তিশালী করা। অবসর সময়ে ভার্চুয়াল জগতে পড়ে না থেকে পরিবারের লোকদের সঙ্গে সময় কাটানো। তাদের বোঝার চেষ্টা করা। তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা।

কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণের একটি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ‘ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতি মহান আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।’ (সুরা : মুহাম্মদ, আয়াত : ২২-২৩)

ক)পিতামাতা ও সন্তানের বন্ধনঃ

সন্তানের জন্য সবচেয়ে আপন হলো মাতা-পিতা। তদ্রুপ মাতা-পিতার জন্য সবচেয়ে আপন হলো সন্তান। সুসন্তান পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তির এবং পরকালে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। ধন-সম্পদ প্রাণ রক্ষার মাধ্যম, আর সন্তান বংশ রক্ষার মাধ্যম।

মহানবী (সা.) বলেন, পিতা সন্তানকে শিষ্টাচারের চেয়ে উত্তম কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। (তিরমিজি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪২৩)০

মাতা-পিতার কাছে সন্তানের পাওনা

সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার রয়েছে অসংখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেগুলো হলো—

একত্ববাদের বাণী শোনানো : সন্তান জন্মের পর প্রথম সুন্নত কাজ হলো ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেওয়া। এর ফলে সন্তানের কানে সর্বপ্রথম একত্ববাদের বাণী পৌঁছে। আবু রাফে (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে দেখেছি,

ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভে হাসান (রা.) জন্মগ্রহণ করলে তিনি তাঁর কানে নামাজের আজানের মতো আজান দিয়েছেন (তিরমিজি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩)

মহানবী (সা.) বলেন, যখন তোমাদের সন্তান কথা বলতে শিখে তখন তাদের কালেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শিক্ষা দাও।(বায়হাকি)

মহানবী (সা.) অর্থবহ নয় এমন অনেক নাম পরিবর্তন করেছেন। যেমন—আব্দুল ওজ্জা নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন আবদুল্লাহ, আসিয়া নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন জামিলা। বুররা নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন জয়নব।

আকিকা করা : শিশুর জন্মের সপ্তম দিন আকিকা করা সুন্নত। মহানবী (সা.) বলেন, প্রতিটি শিশু তার আকিকার সঙ্গে বন্ধক থাকে।

সুতরাং তার জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে পশু জবেহ করবে, মাথার চুল মুণ্ডন করবে ও নাম রাখবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, ছেলের জন্য দুটি ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকিকা করবে (বায়হাকি)

খতনা করানো : মাতা-পিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হক হলো পুত্রসন্তানের খতনার ব্যবস্থা করা। এটি সুন্নতে ইবরাহিমি। ইবরাহিম (আ.) বৃদ্ধ বয়সে নিজের খতনা নিজে করেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, মানবীয় স্বভাবসম্মত কাজ পাঁচটি। তন্মধ্যে একটি হলো খতনা।

যথাযথ প্রতিপালন : সন্তানকে যথাযথ প্রতিপালন করা মাতা-পিতার অপরিহার্য কর্তব্য। সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, শিক্ষা, চিকিৎসা, রোগমুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যবান হিসেবে গড়ে তোলা এবং জীবনের উন্নতি ও বিকাশকল্পে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো মাতা-পিতার কর্তব্য। তার পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানিসহ প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মহানবী (সা.) হাসান-হোসাইন (রা.)-কে চুমু দিতেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, আপনারা কি শিশুদের চুমু দেন, আমরা তো চুমু দিই না। মহানবী (সা.) তার কথা শুনে বলেন, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নেন, তাহলে আমার কী করার আছে! (বুখারি ও মুসলিম)

দ্বিনি শিক্ষা দান : মাতা-পিতার প্রধান দায়িত্ব হলো স্বীয় সন্তানকে দ্বিনি শিক্ষা দান করা। মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর দ্বিনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৪)

শিষ্টাচার শিক্ষা দান : সন্তানকে নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া মাতা-পিতার প্রধান দায়িত্ব। মহানবী (সা.) বলেছেন, পিতা স্বীয় সন্তানকে শিষ্টাচারের চেয়ে উত্তম কিছু শিক্ষা দিতে পারে না।' (তিরমিজি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪২৩)

বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে মাতা-পিতাকেই। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমার প্রকৃত উম্মত নয়।' (তিরমিজি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪২৩)

ইবাদতে অভ্যস্ত করা : মাতা-পিতার অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ, রোজা, কোরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি ইবাদতে অভ্যস্ত করা। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হয় তখন নামাজ পড়ার তাগিদ দাও এবং যখন ১০ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন নামাজ পড়ার জন্য শাসন করো। আর তখন তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।' (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৮)

সন্তানের জন্য দোয়া : সন্তানকে আদব-কায়দা ও সুশিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, তাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়াও করতে হবে। অনুরূপ সন্তান লাভের জন্য দোয়া করতে হবে। জাকারিয়া (আ.) এভাবে দোয়া করেছেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে নেক সন্তান দান করুন, অবশ্যই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৮)

বিয়ের ব্যবস্থা করা : সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা মাতা-পিতার অন্যতম দায়িত্ব। মহানবী (সা.) তিনটি কাজ দ্রুত করতে বলেছেন—১. ওয়াক্ত হলে নামাজ পড়া, ২. ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা, ৩. জানাজা উপস্থিত হলে জানাজা পড়া। (তিরমিজি ও মিশকাত)

মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

লেখক : প্রধান ফকিহ, আল-জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা, ফেনী।

খ)ভাই-বোনের বন্ধনঃ

রাসুল (সা.) বলেছেন, যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, অথবা দুটি মেয়ে অথবা দুটি বোন আছে, সে তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করলে এবং তাদের (অধিকার) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত আছে। (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১৬)

পৃথিবীতে মা-বাবার পর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভাই-বোনের। একসঙ্গে থাকা, স্কুল-মক্তবে আসা-যাওয়া, গল্প-আড্ডা, বেড়াতে যাওয়া ও মান-অভিমানসহ পরিবারের সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গী থাকে এই ভাই-বোনেরা। মা-বাবার আদর-শাসনে বেড়ে ওঠা অম্লমধুর এই সম্পর্ক একসময় ফিকে হয়ে যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও পরিবার গড়ে ওঠে।

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মাঝে ভাই-বোনের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। তাই যে ব্যক্তি বোনদের প্রতি যত্নশীল হবে তাদের ফজিলতের কথা তুলে ধরে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, অথবা দুটি মেয়ে অথবা দুটি বোন আছে, সে তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করলে এবং তাদের (অধিকার) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত আছে। (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১৬)

এমনকি ঘরে যদি ছোট বা অবিবাহিত বোন থাকে তাদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কোনোভাবেই যেন তারা কষ্ট না পায়, বরং নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করে হলেও বোনদের ভালো রাখার চেষ্টা করা।

এ ক্ষেত্রে জাবের (রা.)-এর একটি ঘটনা খুবই স্মরণীয়। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবের! তুমি বিয়ে করেছ কী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, কেমন, কুমারী না অকুমারী? আমি বললাম, না, বরং অকুমারী। তিনি বলেন, কোনো কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? সে তো তোমার সঙ্গে আমোদ-ফুর্তি করত।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার আব্বা উহুদের যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছেন। রেখে গেছেন ৯ মেয়ে। এখন আমার ৯ বোন। এ কারণে আমি তাদের সঙ্গে তাদের মতো একজন আনাড়ি মেয়েকে এনে একত্র করা পছন্দ করিনি। বরং এমন একটি নারীকে (পছন্দ করলাম) যে তাদের চুল আঁচড়ে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে।

তিনি বলেন, ঠিক করেছ। (বুখারি, হাদিস : ৪০৫২)

তাই দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান ও সফল হতে চাইলে আত্মীয়তা রক্ষা; বিশেষভাবে বোনদের হক এবং মর্যাদা রক্ষার বিকল্প নেই। সাহাবি আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি নবী করিম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার রিজিক প্রশস্ত ও আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। (বুখারি, হাদিস : ৫৯৮৫)

আল্লাহ তাআলা আমাদের ভাই-বোনের মর্যাদা রক্ষা করার তাওফিক দান করুন।

শেষ কথা

ইসলাম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রের মতো পারিবারিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানবজাতির প্রাথমিক ভিত্তি হলো তার পরিবার। পরিবার থেকেই পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সমাজ, অতঃপর অর্থনৈতিক লেনদেন, সেখান থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সুত্রপাত। এভাবে মানবজাতির বিকাশ, সমাজ সভ্যতার সৃষ্টি, সংস্কৃতিবোধের উন্মেষ। যে জাতির পারিবারিক বন্ধন যত দৃঢ় সে সমাজ ততই উন্নত ও শক্তিশালী। পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন মুসলিম সমাজে তার সব কিছুই বিদ্যমান রয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর এই পারিবারিক সুদৃঢ় বন্ধনের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে পাশ্চাত্য সমাজ মুসলিম পারিবারিক বন্ধনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নানা রকম অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হলো আজকের পাশ্চাত্য সমাজে পারিবারিক বিকাশের পরিবর্তে তাদের পরিবার প্রথা ভেঙে পারিবারিক অশান্তি বিরাজ করছে। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের নিয়ে নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত পাশ্চাত্য। তাদের পরিবারে ছোট-ছোট শিশুদের লালনপালন নিয়ে সমস্যা, বয়স্ক লোকদের ভরণ-পোষণ নিয়ে সমস্যা, কর্মহীন লোকদের নিয়ে সমস্যা। কারণ পাশ্চাত্য দর্শনে গঠিত সমাজে বয়স্ক লোকদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় যখন সে কর্মহীন হয়ে পড়ে, তখন তার ঠিকানা হয় বৃদ্ধাশ্রম, আর শিশুদের লালনপালনে সমস্যা, কারণ স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাস করে প্রয়োজনে একত্রে মিলিত হয়। প্রত্যেকেই নিজ চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। এ কারণে কে দায়িত্ব নেবে সন্তানের, অবশেষে সন্তানের ঠিকানা হয় বেবি হোমে। এভাবে বৃদ্ধরা যেমন জীবন সায়াহ্নে এসে বিড়ম্বনার শিকার হন, তেমনি শিশুরা মা-বাবার সান্নিধ্য না পাওয়ার কারণে, তাদের আদর-সোহাগ না পাওয়ার কারণে, তাদের মধ্যে এক প্রকার দয়া-মায়াহীনতা, মা-বাবার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই শিশুরা বড় হয়ে তাদের মা-বাবার খোঁজ নেয় না। তারা যে কোনো মুল্যে সম্পদ অর্জন কর এবং ভোগ কর নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

ইসলামী সমাজে পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব, তাদের পারস্পরিক আচার-আচরণ, সন্তানের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। কারো দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ইসলামে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশু জন্ম হলে তার প্রতি পিতা-মাতার করণীয় সব কিছু নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সন্তান লালনপালনে কষ্টের কারণে ইসলামে তাদের মর্যাদা এত বেশি দেয়া হয়েছে যে, ইসলামে আল্লাহতায়ালার ইবাদতের পরে পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনকে আবশ্যক করে দিয়েছে। মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত ঘোষণা করা হয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি সুন্দর আচরণ করা, তাদের কোনো ধরনের কষ্ট না দেয়া, তাদের সামনে নিজেকে তুচ্ছ করার চাদর বিছিয়ে দেয়া, কোনো কারণে তারা উহ-আহ্ করতে পারে এ ধরনের আচরণকে সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এমনকি তারা যখন বৃদ্ধ হয় তখন তাদের সেবার মাধ্যমে জান্নাত লাভ করতে না পারাকে চরম ব্যর্থতা বলা হয়েছে। রাসুল সা. বলেছেন-‘যে ব্যক্তি পিতা-মাতার যে কোনো একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, অথচ সে জান্নাত লাভ করতে পারল না তাদের নাক ধুলিময় হোক।’ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক সম্পর্কে রাসুল সা. যে আদর্শ শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন তার কোনো তুলনা হয় না। হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন- জনৈক সাহাবী রাসুল সা.-কে জিজ্ঞাসা করেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার নিকট সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার কে বেশি হকদার? তিনি বললেন-তোমার মা, অতঃপর তিন তিন বার একই উত্তর দিলেন, চতুর্থবার বললেন তোমার বাবা।’ মুহাদ্দিসিনে কেরাম লিখেন মা-বাবার মধ্যে সন্তানের কাছ থেকে সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে মা বাবার চেয়ে তিনগুণ বেশি অধিকার রাখেন। কারণ মা’ই সন্তানকে লালনপালন, ভরণ-পোষণ করার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এখন সন্তান যদি বেবি হোমে বড় হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মা সন্তানের কাছ থেকে কতটুকু সেবা দাবি করতে পারেন। যেই মা সন্তানের জন্য তার সামান্য সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করতে পারল না, যে মা আদর্শ সন্তান গঠনের চেয়ে নিজের সাময়িক চাহিদা পুরণকেই অগ্রাধিকার দিল, সেই সন্তানের প্রতি কতটুকু অধিকার দাবি

করতে পারে? একজন আদর্শ মাই তো পারেন আদর্শ জাতি গঠন করতে, আদর্শ সমাজ গঠন করতে।

বর্তমান সমাজে একক পরিবার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম দেশগুলোও মায়া-মহব্বত হ্রাস পাচ্ছে। পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে। বিশ্বায়ন ও শহরায়নের ফলে মানুষের মধ্যে ছোট পরিবার গঠন আমাদের কিছুটা স্বার্থপর জাতিতে পরিণত করছে। আমাদের মা-বাবারা এখনই বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়া শুরু করেছে। এটা মুসলিম জাতির জন্য চরম অধঃপতন। একবার একটি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে দেখেছি মুরুব্বিদের আহাজারী আর বেদনার চিত্র, তাদের কষ্টের কথা, তাদের অবহেলার কথা। অথচ একদিন তারাই ছিলেন পরিবারের মধ্যমণি। তাদের আয়-রোজগার দিয়েই ছেলেমেয়েরা ফুর্তি-আমোদ করে দিন কাটাতো। পাশ্চাত্যের প্রভাবে আমাদের মুসলিম সমাজের মেয়েরা স্বামীর পিতা-মাতাকে, তাদের ছোট-ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে একসঙ্গে থাকার ব্যাপারে কঠিনভাবে বিরুপ মানসিকতায় গড়ে উঠছে। ফলে পারিবারিক অশান্তি বেড়ে যাচ্ছে। ইসলামী আদর্শকে অবহেলা করার পরিণাম ফল শুভ হয় না। হচ্ছেও তাই। হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রিযিকের প্রসন্নতা কামনা করে এবং দীর্ঘায়ু ও প্রাচুর্য কামনা করে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।' রাসুল সা. বলেন-'সেই ব্যক্তি প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় যে ভালো ব্যবহারকারী আত্মীয়ের খোঁজ-খবর নেয়, বরং প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ওই ব্যক্তি যে সম্পর্ক ছিন্নকারী আত্মীয়ের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলে।' ইসলাম আত্মীয়ের হক আদায়ের ব্যাপারে যে নির্দেশনা দেয় সে ক্ষেত্রে মা-বাবার সঙ্গে কিরুপ সম্পর্ক থাকা উচিত? সবার সঙ্গে সু-সম্পর্ক রাখতে হবে। এভাবে পরিবার বিকাশ লাভ করে, সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়, পারস্পরিক হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। সুখে-দুঃখে মানুষ একে অপরকে সহযোগিতা করে, সহমর্মিতা দেখায়। আমাদের পরিবার প্রথার অন্যতম আকর্ষণীয় দিক ছিল পরিবারে দাদা-দাদি আর নানা-নানি এবং ছোট নাতি, পুতি নিয়ে এক প্রকার আনন্দময় সংসার। যৌথ পরিবারে কিছু অসুবিধা পরিলক্ষিত হলেও সুবিধাই ছিল বেশি। যৌথ পরিবারে ছেলেমেয়েদের লালনপালনে দাদা-দাদিরা খুব গুরুত্বপুর্ণ

ভুমিকা পালন করেন। শিশুরা তাদের কাছ থেকে গল্পের ছলে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। অথচ আজকের একক পরিবারে একটি সন্তান পালন করাও কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

পরিবার গঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য প্রবৃত্তির চাহিদা নিবারণ হলেও এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বংশধারা সংরক্ষণ, স্হিতিশীল সমাজ গঠন, মানবজাতির বিকাশ এবং পুর্ণ শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা। অন্যায়-অশ্লীলতা পরিহার করা। ইসলামী সমাজ রক্ষায় আমাদের পারিবারিক বিকাশকে সঠিক আদর্শের ওপর গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশুকাল থেকে সন্তানদের সঠিক শিক্ষা নিয়ে গড়ে তুলতে হবে। নিজেদের যেমন বেঁচে থাকতে হবে, তেমনি আমাদের বৃদ্ধদের, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার সুন্দর পথ বেছে নিতে হবে। পাশ্চাত্য যে ভুলের খেসারত দিচ্ছে আমাদের ইচ্ছে করে সে ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হবে। তাহলেই প্রকৃত সুন্দর পরিবার গঠন সম্ভব। সার্থপরতা আমাদের কারো জন্যই সুখকর নয়। সাময়িক সুখ লাভের আশায় দীর্ঘদিনের অশান্তি টেনে আনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমার দেশ, ৬ জুন ২০০৮

পরিবারের সুখ, শান্তি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়াও রয়েছে একটি আইনগত ও সামাজিক দিক। জীবনের সব পর্যায়ে যদি আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (সা.) প্রদর্শিত বিধান মেনে চলা যায়, তাহলেই পারিবারিক বিপর্যয়রোধ সম্ভব হবে। নতুবা মানবীয় প্রচেষ্টা মরীচিকার মতো নিষ্ফল ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইসলামে পরিবারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিবারের সব সদস্যের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও মনের প্রশান্তি লাভ। নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের শিক্ষা পরিবার থেকে লাভ করে মুসলিম সন্তানরা।

তাই আসুন, আমরা কোরআন এবং হাদিসের আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবার প্রতিষ্ঠা করি। তাহলেই একটি সমাজ ও রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আওতায় আসতে বাধ্য।

সমাপ্ত